Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মমতাজ খাতুন

রোলঃ 227020190

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মমতাজ খাতুন

রোলঃ 227020190

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুমিনের গুণ ও মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মমতাজ খাতুন, আইডিঃ 227020190 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুমিনের গুণ ও মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মমতাজ খাতুন

আইডিঃ 227020190

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 1

মুমিনের পরিচয়: 1

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত কিছু মুমিনের মর্যাদা 25

দুনিয়ার পুরস্কার 25

আখিরাতের পুরস্কার 27

ভূমিকা:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।
ইসলাম ধর্মে মুমিনের গুরুত্ব অপরিসীম। মুমিন শব্দটি আরবি "ইমান" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বিশ্বাস স্থাপনকারী। মুমিন সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখেন এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। মুমিনের গুণাবলী শুধু তার ব্যক্তিগত উন্নয়নেই নয়, বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই থিসিসে মুমিনের গুণাবলী ও তাদের মর্যাদা কুরআন, হাদিস এবং সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

মুমিনের পরিচয়:

মুমিন আরবী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাসকারী বা বিশ্বাসী। পারিভাষিক অর্থে ইসলামের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর তথা "আল্লাহর ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবের উপর, সকল নবী- রাসূলদের ওপর, পরকালে পুনরুদ্ধার দিবস এবং তাকদীর বা ভাগ্যের" ওপর যে ব্যক্তি কোন প্রকার সন্দেহ-প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মেনে চলে, তাকেই মুমিন বলা হয়। এই বিষয়ে জিবরাঈল (আ.) নবী (স.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন-
"আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখেরাতের দিনের প্রতি এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি তোমরা ঈমান আনো"।

১. ঈমানের দৃঢ়তা ও অদৃশ্যে বিশ্বাস:

মুমিনের প্রথম এবং প্রধান গুণ হলো তার ঈমান। আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস একজন মুমিনকে পাপ ও গোনাহ থেকে বিরত রাখে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

"মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং পরে আর সন্দেহ করেনি..."
(সূরা আল-হুজরাত: ১৫)।
মুমিনের ঈমানের দৃঢ়তা তাকে কষ্টসহিষ্ণু এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। অন্যদিকে অদৃশ্যে ঈমান আনয়ন মানে- যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুভব করা যায় না, এমন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা। যেমন- আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ওহী, ফেরেশতা, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ সত্যগুলোকে না দেখে বিশ্বাস করা এবং প্রদত্ত খবরের ওপর আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে ঈমান বিলগায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস।
আল কোরআন থেকে কেবল তারাই হেদায়াত লাভ করবে যারা অদৃশ্যমান বিষয়গুলোর ব্যাপারে মুমিন হবে। আর যদি কেউ এমন চিন্তা করে যে, না দেখে, না বুঝে, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বাদ-আস্বাদন না নিয়ে তোমার মত কোন জিনিস আমি মেনে নিতে পারি না, তাহলে সে কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না, অদৃশ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস একটি পরীক্ষার মতো। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন-
"তারা বলে, এ নবীর কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন? যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে এতদিনে কবেই ফয়সালা হয়ে যেত, তখন আর তাদের অবকাশই দেয়া হতো না।" (সূরা আল আনআম: ৮)
একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হবে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন ছাড়াই এ অদৃশ্য সত্যগুলোকে সত্য বলে অনায়াসেই মেনে নিবে এবং শুধু নিজেই বিশ্বাস করে ক্ষান্ত হবে না বরং অন্যকেও বিশ্বাস করতে উপদেশ দিবে। শুধু তাই নয় কাউকে অস্বীকার করতে দেখলে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্যে বিশ্বাসীদেরকেই মুমিন বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন অর্থাৎ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে, তারাই কেবল মুমিন বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ.
"এটি এমন একটি কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। হেদায়াত সেই মুত্তাকিদের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল বাকারা: ২-৩)

২. নামাজের প্রতি আন্তরিকতা:

মুমিন খুশুখুযুর সাথে সালাত আদায় করবে। খুশু শব্দের অর্থ হচ্ছে কারো সামনে ঝুঁকে পড়া, বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থার সম্পর্ক দেহ ও মন দুয়ের সাথেই হবে। মনের খুশু হলো- মানুষ কারও শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব, প্রতাপ ও পরাক্রমশীলতার দরুন তার সামনে সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর অপরদিকে দেহের খুশু হলো- যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনম্র হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত থাকবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে। নামাযে খুশু বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীস শরীফে এসেছে- একদা নবী করীম (স.) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নাড়াচাড়া করতে দেখে বললেন, "যদি তার মনে খুশু থাকত তাহলে তার দেহেও খুশুর সঞ্চার হতো।"

নামাযের প্রত্যেকটি কাজ ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে করতে হবে। একটি কাজ পুরোপুরি শেষ না হতেই অন্য কাজ আরম্ভ করা যাবে না। নামাযে কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকলে এক হাতে তা সরিয়ে দেয়া যাবে, কারণ ঐ জিনিসটাই নামাযে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু বারবার হাত নাড়া-চাড়া অথবা দুই হাত এক সাথে ব্যবহার করা যাবে না। ডানে বামে ফিরা যাবে না, মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে তাকানো যাবে না, চিন্তা-ভাবনা, হিসাব-নিকাশ করা যাবে না। দৃষ্টিকে সামনের দিকে রাখতে হবে। হানাফি ও শাফিয়িদের মতে, দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম করা যাবে না। বারবার পরিধেয় বস্ত্র গুটান, ঝাড়া বা তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় সিজদার জায়গা, বসার জায়গা পরিষ্কার করা যাবে না। গর্বিত ভঙ্গিতে খাড়া হওয়া, অধিক জোরে কোরআন পড়া, জোরে জোরে আড়মোড়া ভাঙ্গা এবং তাড়াহুড়া করে টপটপ নামায পড়া যাবে না। একজন মুমিন যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন সে পৃথিবীর সকল কিছু থেকে তাঁর মন মানসিকতা, চিত্তা-চেতনা, দেহ-মন সবই এক আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যেমন এক আল্লাহর দিকে মুতাওয়াযযাহ হলেন। কোরআনের ভাষায়-

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا.

"আমি একনিষ্ঠভাবে মুখ ফিরালাম সেই মহান সত্তার দিকে যিনি ঐ আকাশ আর যমীনের সৃষ্টিকর্তা।" (সূরা আল আনআম: ৭৯)

অর্থাৎ, মুমিন যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, তক এবং কালব সবই এক আল্লাহর জন্যই হয়ে যেতে হবে। মুমিন নামায পড়বে আর ভাববে- মনে করবে, আমি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান, আমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি। অন্ততপক্ষে এতটুকু ভাবতে হবে বা মনে করতে হবে আল্লাহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

৩.মুমিন অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে:

অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন কথা ও কাজ যাতে কোন ফল পাওয়া যায় না যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয় এবং উদ্দেশ্যও ভাল নয়। যেগুলোর আসলে প্রয়োজন নেই, না বললেও চলে। যার কারণেই একজন মুমিন সকল প্রকার অনর্থক এবং বাজে কাজ থেকে দূরে থাকবে এবং এটি তার ঈমানের অন্যতম একটি গুণ ও বটে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে বর্ণিত রয়েছে-

"এবং তারা (মুমিনরা) অর্থহীন বাজে ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে নিজ মর্যাদা রক্ষা করে তা পরিহার করে চলে যায়।" (সূরা আল ফুরকান: ৭২)

একজন মুমিনের সম্মান-মর্যাদা অপরিসীম, অনর্থক কথা ও কাজ তার মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মূল্যহীন কোন কথা বা কাজ নিজের মধ্যে আনতে পারে না। মুমিনগণ সর্বদা সময়ের মূল্য দেয় এবং দায়িত্ব পালনে সর্বদা সজাগ থাকে। সে এ দুনিয়ার জীবনকে একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র মনে করবে। একজন ছাত্র যখন পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিচ্ছে সে তখন মনে করে তার পরীক্ষার হলের প্রতিটি মুহূর্ত তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী। এ অনুভূতির কারণে সে প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্ন পত্রের সঠিক উত্তর লেখার চেষ্টায় ব্যয় করে। সে একটি মুহূর্তও বাজে কাজে ব্যয় করে না। ঠিক তেমনি একজন মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনকালকে এমনভাবে পরিচালনা করে যা পরিণামের দিক দিয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হয়। মুমিন হয় একজন শান্ত ও প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। সে সর্বদা ফলদায়ক কথা ও কাজ করে চলে এবং আজে-বাজে, গল্প-গুজব করা তাঁর স্বভাব হতে পারে না। সে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও হালকা পরিহাস (সত্যের সাথে মিল রেখে) পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনকে জান্নাতে অনেক নেয়ামতের অধিকারী করবেন তার

মধ্যে অন্যতম হলো সেখানে তাদেরকে কোন প্রকার বাজে কথা শুনাবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(সেখানে তারা (মুমিনরা) কোন বাজে কথা শুনবে না।" (সূরা গাশিয়া: ১১)

আল্লাহ তায়ালা যে আচরণকে জান্নাতের নেয়ামত হিসেবে বর্ণনা করেছেন, মুমিন সে নেয়ামতের বিপরীত কোন আচরণ দুনিয়ায় করতে পারে না। মুমিন প্রতিটি কাজ আর কথার পূর্বে চিন্তা করে আমার তো প্রতিটি কাজ ও কথা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং হাশরের ময়দানে সবকিছু আমার সামনে উপস্থিত করা হবে আর হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন,

"অতঃপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা আয যিলযাল: ৭-৮)

৪.মুমিন যাকাত দেওয়ার প্রতি সক্রিয় ও যত্নশীল থাকবে:

যাকাত আদায় বা প্রদান প্রকৃত মুমিনের পরিচয় বহন করে। যাকাত ইসলামের মূল ভিতের অন্যতম একটি। এটি আবশ্যকীয় আর্থিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর ভিত বলা হয় ওই বস্তুকে যাকে নির্ভর করে মূল বস্তুটি গড়ে ওঠে। হাদিস শরিফে যাকাতকে ইসলামের ভিত উল্লেখ করে বিশ্বনবী (সা.) বলেন, ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি।

১. আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল—এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. জাকাত আদায় করা, ৪. হজ করা এবং ৫. রমজানের রোজা রাখা। (বুখারি, হাদিস : ৮)

জাকাতের প্রধান ও মূল উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর বিধান পালনের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন। যাদের সম্পদ অর্জনের কোনো যোগ্যতা বা সামর্থ্য ও সুযোগ নেই কিংবা পূর্বসূরিদের কাছ থেকে জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা পাওয়ার সুযোগ নেই তাদের অধিকার আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন ধনীদের সম্পদে। যারা তা আদায় করবে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত উপকারিতা এবং মহা প্রতিদান। কোরআনুল কারীমে

ইরশাদ হয়েছে, 'এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদের মহাপুরস্কার দেব।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১৬২)

যাকাত হলো দাতার দৃঢ় ও মজবুত ঈমানের পরিচয় ও নিদর্শন। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। সম্পদের মায়া ত্যাগ করে খুশি মনে দান

করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের আলামত। এই মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল, তিনি যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদের দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা সদকা করব এবং নিঃসন্দেহে আমরা সেলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' (সুরা তাওবা, আয়াত : ৭৫)
তাই একনিষ্ঠভাবে যাকাত প্রদান করা প্রকৃত মুমিনেরই পরিচয়।

৫.লজ্জাস্থান হেফাজত মুমিনের ভূষণ:

ইসলামে লজ্জাস্থানের হেফাজত করা এমন একটি বিষয়, যা একজন মুমিনের ঈমান ও চরিত্রের পরিচায়ক। এটি কেবলমাত্র শারীরিক পবিত্রতার জন্য নয়, বরং এটি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও অপরিহার্য।
বিশ্বনবী (স.) বলেছেন- "কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিবে না।" (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ)

লজ্জাস্থানের হেফাযত কেবলমাত্র প্রবৃত্তির বাসনা থেকে দূরে থাকা নয়, নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। হযরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী (স.) বললেন "তুমি কি জানো না রান ঢেকে রাখার জিনিস?" কেবল অন্যের সামনে নয় একান্তেও উলঙ্গ থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন-
"সাবধান কখনো উলঙ্গ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সত্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা), তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া। কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো, তাদের সম্মান করো।" (তিরমিযী)
শরীয়তে পুরুষের ন্যায় নারীদের ব্যাপারে দৃষ্টি সংযমের ব্যাপারে বিধান বিদ্যমান রয়েছে। তারা পুরুষের মতোই ভিন্ন পুরুষদের দেখতে পারবে না। একদা হযরত উম্মে সালামাহ ও হযরত উম্মে মাইমুনাহ নবী (স.) এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম এসে গেলেন। তখন নবী (স.) উভয় স্ত্রীকে বললেন: তাঁর থেকে পর্দা করো। স্ত্রীদ্বয় বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল (স.) তিনি কি অন্ধ নন? তিনি

তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না; রাসূল (স.) তখন বললেন: 'তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?' (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

সুতরাং মুমিন নারী হোক অথবা পুরুষ হোক সে কোরআন ও হাদীসের ভাষ্যমতে পর্দা অবলম্বন করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে বলেন-

"(হে নবী) মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটি তাদের জন্য বেশি পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। (হে নবী) মুমিন মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে আর তাদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।" (সূরা আন নূর ৩০-৩১)

এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর একাধিক হাদীস রয়েছে। যেমন:

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোন মহিলার ওপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কি করতে হবে? রাসূল (স.) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, 'তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নিবে।" (মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন: "মহিলারা হল পর্দায় থাকার বস্তু, সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপক্ষো করে) বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সু-সজ্জিত করে দেখায়।" (তিরমিযী)

মহিলারা হলো, পেঁয়াজের ন্যায়। পেঁয়াজের খোসা ফেলে দিলে যেমন পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায় দুই/তিন দিনের মধ্যে এবং তা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। অনুরূপভাবে মহিলারা যদি বেপর্দা হয়ে যায় তখন পেয়াজের ন্যায় আত্ম-মর্যাদা হারিয়ে সমাজের নিন্দনীয় শ্রেণীতে পরিণত হয়। যার ফলে সমাজ দূষিত হয়ে যায়, নেমে আসে অসুস্থ পরিবেশ। লজ্জাস্থানের হেফাজত প্রত্যেক মুমিনের অন্যতম একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও। লজ্জাস্থানের হেফাজত করা শুধু ধর্মীয় নয়, এটি একজন মুমিনের জীবনের জন্য এক অপরিহার্য গুণ। এ কাজের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করতে পারি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারি। সুতরাং, আল্লাহর হুকুম পালন করে নিজেদের পবিত্র রাখা আমাদের দায়িত্ব।

৬.মুমিন আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে:

আমানত শব্দের অর্থ বিশ্বস্ততা, আস্থা, নিরাপত্তা, আশ্রয়, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে ‘আমানত রক্ষা করা’ বলে কারো কাছে কোনো সম্পদ, অর্থ, বস্তু গচ্ছিত রাখা হলে বিশ্বস্ততার সাথে তা রক্ষা করা এবং মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া বোঝানো হয়। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় ‘আমানত’ শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। এটি শুধু গচ্ছিত রাখা অর্থের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। যাবতীয় হক ও দায়-দায়িত্ব বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করা এবং প্রত্যেক ধর্তব্য ও বিবেচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা এর অন্তর্ভুক্ত। যে কোনো ধরনের ভেজাল, দুর্নীতি, অন্যের হক নষ্ট করা, নিজের দায়িত্বে অবহেলা করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা ইসলামে আমানতের খেয়ানতের মধ্যে পড়ে। ইসলামে আমানত রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কর্তব্য। অমানতের খেয়ানত করা মহাপাপ। একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সব ধরনের আমানতের ব্যাপারে যত্নবান থাকা। কোরআনে সুরা মুমিনুনের শুরুতে মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

“যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে যত্নবান। (সুরা মুমিনুন: ৮)”

হকদারদের কাছে তাদের হক বা আমানত পৌঁছে দেওয়া ও ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়ে আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতাআলা বলেন,

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। (সুরা নিসা:৫৮)

আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন হাদিসেও আমানত রক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রায় প্রতিটি খুতবায় বলতেন, যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই, যার কাছে নিজের ওয়াদা বা কথার মূল্য নেই, তার দীন বলতে কিছু নেই। (মুসনাদে আহমদ)

আমানতের খেয়ানতকে মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ঝগড়ার সময় গালাগালি করে। যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। (সহিহ বুখারি: ৩১৭৮)

অন্যদিকে ওয়াদা হলো প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং তা পূরণ করা। একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কোরআনের আলোকে ওয়াদা রক্ষা: আল্লাহ বলেন,

"তোমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ করো, কারণ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"(সুরা আল-ইসরা: ৩৪)

ওয়াদা ভঙ্গকে মুনাফিকের গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

মুমিনের জন্য আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করা একটি মৌলিক দায়িত্ব। এটি ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে। যারা এ গুণগুলো ধারণ করে, তারা দুনিয়ায় সম্মানিত হয় এবং আখিরাতে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কৃত হবে। তাই প্রতিটি মুমিনের উচিত আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে আমানত ও ওয়াদা রক্ষায় সতর্ক থাকা।

৭. মুমিন সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে:

মুমিনের জীবনে আল্লাহভীতি (তাকওয়া) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এটি এমন এক বিশেষ অনুভূতি, যা মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতে প্রেরণা দেয় এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে। আল্লাহভীতি কেবল ভয় নয়; এটি আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের এক আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

মুমিন তার অন্তরে সার্বক্ষণিক আল্লাহ তা'আলার ভয় লালন করে। এই জন্য শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মুমিন সে আল্লাহর উপর এমন আস্থাশীল থাকে যে, কোন বিপদও তাকে আল্লাহর বিধান থেকে গাফিল করতে পারে না, বরং তার ঈমানের জযবা আরো বেড়ে যায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, "যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম,তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে"। (সূরা আনফাল ৮:২)

আল্লাহভীতি একজন মুমিনকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং ন্যায় ও ইনসাফের পথে পরিচালিত করে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহভীরু ব্যক্তিই সফল।"(সূরা আ'লা: ১৪)

আল্লাহভীতি একজন মুমিনকে আশার সঙ্গে ভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে শেখায়। সে জান্নাতের আশা করে, কিন্তু একই সঙ্গে জাহান্নামের শাস্তি থেকেও ভয় পায়।

আল্লাহ বলেছেন:
"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকওয়াশীলদের (আল্লাহভীরুদের) ভালোবাসেন।"(সূরা আত-তাওবা: ৭)
একজন মুমিন যখন আল্লাহর শাস্তির কথা মনে করে, তখন সে পাপ করার সাহস পায় না। হাদিসে এসেছে:
"আসল বুদ্ধিমান সে, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়।"
— (তিরমিজি)
আল্লাহভীতি মুমিনের আমলকে শুদ্ধ করে। তার প্রতিটি কাজ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়। কুরআনে এসেছে:
"যে ব্যক্তি তাঁর রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিজেকে পাপ থেকে বিরত রাখে, তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত।"
(সূরা আন-নাজিয়াত: ৪০-৪১)
মুমিনের জন্য আল্লাহভীতি জীবনের ভিত্তি। এটি তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, গুনাহ থেকে বাঁচায়, এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহভীতির মাধ্যমে একজন মুমিন আখিরাতে সফলতা লাভ করে এবং পৃথিবীতেও সম্মানিত জীবনযাপন করতে পারে।

৮.মুমিন এক আল্লাহর উপরেই ভরসা করে:
মুমিনের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মুমিনের বিশ্বাস যে, সমস্ত কিছু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন মুমিন একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং দুনিয়ার কোনো মাধ্যমকে চূড়ান্ত বলে মনে করে না।
আল্লাহ সর্বশক্তিমান আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক, এবং নিয়ন্ত্রক। মুমিন জানে যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই ঘটতে পারে না। কুরআনে আল্লাহ বলেন:
"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।"(সূরা আত-তালাক: ৩)
মুমিন বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সব জানেন এবং তাঁর পরিকল্পনা সবসময় শ্রেষ্ঠ। মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে সবকিছু বুঝতে পারে না, কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা সবসময়ই কল্যাণময়।

"তোমরা যদি মুমিন হও, তবে আল্লাহর উপরই ভরসা করো।"(সূরা আল-মায়েদা: ২৩) মুমিন জানে যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তার রিজিক, জীবন বা মৃত্যু নির্ধারণ করতে পারে না। তাই সে কেবল আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।

মুমিন দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চান। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে:

"আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক।" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

মুমিন যখন আল্লাহর উপর ভরসা করে, তখন তার মনে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জন্মায়। কারণ সে জানে, আল্লাহ তার সাথে আছেন। মুমিন জানে যে, আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী যা ঘটে তা কল্যাণকর। এতে দুশ্চিন্তা কমে যায়।

আল্লাহর উপর ভরসা মানুষকে মানসিক শান্তি দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ', এবং সৎপথে অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই।"(সূরা আল-আহক্বাফ: ১৩)

নবীদের তাওয়াক্কুল থেকে মুমিন শিক্ষা নিতে পারে,

১.নবী ইবরাহিম (আ.)-এর তাওয়াক্কুল:

যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন:

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

— (সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৯)

আল্লাহ তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

২. নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর তাওয়াক্কুল:

হিজরতের সময় গুহায় আশ্রয় নেওয়ার সময়, যখন আবু বকর (রা.) ভীত হয়েছিলেন, তখন নবী (সা.) বলেছিলেন:

"দুঃখিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

— (সূরা আত-তাওবা: ৪০)

মুমিনের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা হলো ঈমানের মূল ভিত্তি। এটি তাকে জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জে ধৈর্যশীল, সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলে মুমিন সবসময় আল্লাহর রহমত এবং সাহায্যের আশায় থাকে। এটি তাকে আখিরাতে জান্নাতের পথেও পরিচালিত করে।

৯.মুমিন আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে দান করে:

মুমিনের অন্যতম গুণ হলো আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে দান করা। দান কেবল দুনিয়ার সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া নয়; এটি একটি ইবাদত, যা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ এবং মানবকল্যাণে অবদান রাখার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের রিজিক দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং দানের মাধ্যমে তাদের ঈমানকে আরও পরিপূর্ণ করার সুযোগ দেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

"তোমরা যেসব উত্তম বস্তু উপার্জন করো এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে দান করো।"(সূরা আল-বাকারা: ২৬৭)

দানের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। নবী (সা.) বলেছেন:

"দান দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করে।"(তিরমিজি)

আল্লাহ বলেন:

"যারা আল্লাহর পথে দান করে, আল্লাহ তাদের জন্য সাতশত গুণ বা তারও বেশি বাড়িয়ে দেন।"(সূরা আল-বাকারা: ২৬১)

মুমিনের জন্য আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে দান করা হলো ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কেবল দুনিয়ার কল্যাণে নয়, আখিরাতের মুক্তির পথও সুগম করে। আল্লাহর পথে দান করার মাধ্যমে মুমিন নিজের ঈমানকে আরও মজবুত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

১০.মুমিন রবের সাথে কাউকে শরীক করে না:

মুমিন কখনোই রবের সাথে কাউকে শরীক করে না, কারণ এটি তাওহিদের মূল ভিত্তি। তাওহিদ মানে এক আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য, মালিক এবং রিজিকদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা (শিরক) ইসলামের সবচেয়ে বড় পাপ, যা ঈমানকে ধ্বংস করে এবং আখিরাতে শাস্তি ডেকে আনে।

চলনে-শয়নে, গ্রহণে-বর্জনে, বলনে-নয়নে, সকল স্থানেই একমাত্র আল্লাহর তাওহীদকে লালন করতে হবে। দাসত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ তায়ালা। তাঁর সামনেই মাথানত করতে হবে। আনুগত্যের মস্তক একমাত্র তাঁর সামনেই নত করে দিতে হবে। ইবাদত-বন্দেগি, জীবন-মরণ সকল কিছু শুধুমাত্র- কেবলমাত্র একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে, এখানে কাউকে বা কোন কিছুকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

"বল আমার নামায, আমার কোরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।" (সূরা আল আনআম: ১৬২)

এই ক্ষেত্রে মুমিন কাউকে অংশীদারিত্ব করবে না। লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে মুমিন কোনো দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করবে না। কেননা, সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহরই দাস হিসেবে বিশ্বাস করে তাই তারই নির্দেশ পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহর নির্দেশও অনুরূপ-

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর বন্দেগি করো তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।" (সূরা আন নিসা: ৩৬)

যে কেউ আল্লাহর সাথে কোনো বিষয়কে শরীক করলো তো সে সংগে সংগে আল্লাহর কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিল অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তার সাথেই তার সম্পর্ক গড়ে উঠে যাকে সে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব করলো। হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন: আমি মুশরিকদের শিরক থেকে মুক্ত-পবিত্র (আমার কোনো শরীক নেই),

যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো, যাতে আমার সাথে আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে। আমি তার সাথে সম্পর্কহীন, তার সম্পর্ক তার সাথে, যাকে সে শরীক করেছে।" (মুসলিম)

আগুন যেমন লাকড়িকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় তেমনি শিরক মানুষের পুণ্য কাজকে জ্বালিয়ে দেয়। এই শিরকের বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে যা না জানার কারণেও আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত শিরক সংঘটিত হয়ে থাকে। শিরক প্রথমত চার প্রকার। যথা:

১.আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে শিরক:

আল্লাহ ব্যতীত আরো ইলাহ, রব আছে বলে বিশ্বাস করা, আল্লাহর সন্তান, বিবি আছে বলে আকীদা পোষণ করা, আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"বল, তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" (সূরা আল ইখলাছ: ১-৪)

২.আল্লাহর কর্তৃত্বে শিরক:

সৃষ্টি করা, রিযক দেয়া, জীবন মৃত্যু দেয়া, রোগ মুক্ত করা, মান সম্মান দেয়া, বিপদ থেকে উদ্ধার করা, আইন দেয়া, আসমান যমীন পরিচালনা করা ইত্যাদি
ক্ষেত্রে কাউকে সম্পৃক্ত মনে করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
"বল তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? (সূরা আল আহকাফ: ৪)

৩. আল্লাহর নামের সাথে শিরক:

আল্লাহ তায়ালার নাম হলো দু'প্রকার। সত্তাগত ও গুণবাচক নাম। সত্তাগত নাম হল আল্লাহ)الله(কোন মাখলুকের নাম আল্লাহ রাখা হলে তা হবে সত্তাগত নামে শিরক। এমনিভাবে আল্লাহর নামে মূর্তির নাম রাখা, (যেমন: ইলাহ থেকে লাত, আযীয থেকে উযযা, মান্নান থেকে মানাত ইত্যাদি নামকরণ করা আল্লাহর গুণবাচক নামের সাথে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।

৪.আল্লাহর সাথে শিরক:

আইয়ামে জাহেলিয়াতে এ শিরকই বেশী প্রচলিত ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন মূলতঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ-কে নিষেধ করার জন্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-
"আল্লাহর ইবাদত করা ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।" (সূরা আন নাহল: ৩৬) الشِّرْكُ فِي الْأُلُوهِيَّة. বা ইবাদতে আল্লাহর সাথে শিরক আবার দুই প্রকার।যেমন-

বড় ধরনের শিরক:

নিম্নলিখিত কাজগুলো বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত:১. কবরকে মসজিদ অর্থাৎ সাজদার জায়গা বানানো।

২. কবরকে সামনে রেখে ইবাদত করা।

৩. কবরে বাতি জ্বালানো।

৪. কবরকে উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ বানানো, কবরের উপর চাঁদর জড়ানো, কবরকে কেন্দ্র করে লোক জমানো ইত্যাদি।

৫. কোন গাছ, পাথর, স্থান, কবর ইত্যাদি ধরনের কোন কিছুর দ্বারা বরকত নেয়া।

৬. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যে কোন জন্তু যবেহ করা।

৭. আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন দেবতা, মূর্তি, মাজার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কোন কিছু পেশ করা।

৮. গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা।

৯. বিপদ থেকে বাঁচার জন্য গায়রুল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

১০. বালা-মুসীবত হতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে বালা, তাগা, সুতা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা,

১১. যাদু, গণনায় বিশ্বাস করা।

১২. গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা।

১৩. কুলক্ষণে বিশ্বাস করা।

১৪. নবী-রাসূল, ওলী-আউলিয়া সর্বত্র হাজির হতে পারেন বলে বিশ্বাস করা।

ছোট ধরনের শিরক:

নিম্নলিখিত কাজগুলো ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত:

১. লোক দেখানো কোনো কাজ করা।

২. সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করা।

৩. আমলের দ্বারা দুনিয়া লাভ করা উদ্দেশ্য হওয়া।

৪. কোন কথায় আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্যের ইচ্ছাকে শরীক করা।

৫. 'যদি' শব্দ ব্যবহার করে কথা বলা। যেমন কেউ বললো- যদি অমুক না থাকত তাহলে অমুক আমাকে মেরে ফেলত।

মুমিনের জীবনের মূলনীতি হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ, "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" শিরক থেকে বেঁচে থাকা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। শিরক মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হয়। তাই একজন মুমিনকে সবসময় তাওহিদের ওপর অটল থাকতে হবে এবং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১১.মুমিন আল্লাহর যমীনে নম্রভাবে চলে:

মুমিন আল্লাহর জমিনে নম্রভাবে চলে, কারণ এটি তার চরিত্র ও আচার-আচরণের অন্যতম গুণ। নম্রতা হলো মুমিনের অন্তরের বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর প্রতি বিনম্রতা প্রকাশের বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"রহমানের বান্দারা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা বলে।" (সূরা আল-ফুরকান:৬৩)
অহংকার হলো শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্য, যা মুমিনের ঈমান নষ্ট করে। নবী (সা.) বলেছেন,
"যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (মুসলিম)
মুমিন তার কথায় এবং কাজে সবসময় নম্র থাকে। কারও প্রতি কটূক্তি বা অহংকারী আচরণ করে না।সে নিজের সফলতা বা ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করে না, বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।মুমিন অন্যদের সাহায্য করার সময়ও নম্রতা বজায় রাখে।রাগের পরিস্থিতিতেও মুমিন শান্ত থাকে এবং সংযম প্রদর্শন করে।
মুমিনের জন্য নম্রতা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এটি আল্লাহর জমিনে মুমিনের চলাফেরা, আচরণ, এবং অন্যদের প্রতি তার মনোভাবের প্রতিফলন। একজন প্রকৃত মুমিন সবসময় নম্রভাবে জীবনযাপন করে, অহংকার এড়িয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

১২.মুমিন অপচয় ও করে না, কৃপণতা ও করে না:

মুমিন অপচয় ও কৃপণতা করে না—এই বক্তব্য ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং একজন মুমিনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বনের ধর্ম। এটি এমন জীবনধারার শিক্ষা দেয় যেখানে অপচয় এবং কৃপণতার মধ্যে সুষম ভারসাম্য বজায় রাখা হয়।
অপচয় অর্থ হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা বা সম্পদ এমন কোনো কাজে ব্যবহার করা যা অপ্রয়োজনীয় এবং অকল্যাণকর। ইসলামে অপচয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন:
"তোমরা খাও এবং পান কর, তবে অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"(সূরা আল-আ'রাফ: ৩১)।
অপচয়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ আরও বলেন:
"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।"
(সূরা আল-ইসরা: ২৭)।
মুমিন তার সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যয় করে এবং অপচয় থেকে বিরত থাকে।

অপচয়ের ক্ষতি:

১. অপচয় সম্পদের অবমূল্যায়ন সৃষ্টি করে।

২. এটি সমাজে বৈষম্য বাড়ায়।

৩. শয়তানের পথে ধাবিত হওয়ার কারণ হয়।

মুমিন কৃপণতা করে না।কৃপণতা অর্থ হলো যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় না করা বা অন্যের সঙ্গে সম্পদ ভাগাভাগি করতে অনিচ্ছুক হওয়া। এটি একটি নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ বলেন:

"আর যারা কৃপণতা করে এবং অন্যদেরও কৃপণ হতে বলে, তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"(সূরা আন-নিসা: ৩৭)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

"কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(সহিহ মুসলিম)।

মুমিন তার সম্পদ সঠিক কাজে ব্যয় করে এবং মানুষের সেবায় দান-সদকা করতে কখনো কৃপণতা করে না।

কৃপণতার ক্ষতি:

১. এটি মানুষের প্রতি অবিশ্বাস এবং হিংসার জন্ম দেয়।

2. সমাজে সম্পদ শোষণ এবং অসাম্য সৃষ্টি করে।

3. এটি মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পথে বাধা।

মুমিন ব্যক্তিমধ্যপন্থা অবলম্বন বা জীবনধারা অনুসরণ করে যা অপচয় এবং কৃপণতার মাঝামাঝি।

আল্লাহ বলেন,

"আর যারা ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, অপচয়ও করে না এবং কৃপণতাও করে না, তাদের ব্যয় হয় এই দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থানে।"(সূরা আল-ফুরকান: ৬৭)।

মুমিনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য তাকে আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

মুমিনের জীবনযাপনে অপচয় এবং কৃপণতার কোনো স্থান নেই। একজন মুমিন তার সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে। অপচয়

এবং কৃপণতা থেকে বিরত থেকে মুমিন ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করে, যা তাকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতার পথে পরিচালিত করে।

১৩.মুমিন ব্যক্তির রাত কাটে আল্লাহর ইবাদতে:

মুমিন ব্যক্তির জীবন আল্লাহর ইবাদত এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিবেদিত। বিশেষ করে রাতের ইবাদত মুমিনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি তার ঈমানকে মজবুত করে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম করে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে মুমিনদের রাতের ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটি তাঁদের বিশেষ গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন,

"তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমায় এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।"(সূরা আদ-ধারিয়াত: ১৭-১৮)।

"আর যারা রাত কাটায় তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাহ ও কিয়ামে (দাঁড়িয়ে) ইবাদত করে।"(সূরা আল-ফুরকান: ৬৪)।

এ আয়াতগুলো মুমিনদের রাতের ইবাদতের গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

রাসূল (সা.)-এর রাতে ইবাদতের উদাহরণ:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে রাতের ইবাদত ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দীর্ঘসময় কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এত দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পা ফুলে যেত। তখন তিনি বলতেন,

"আমি কি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারি না?"(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)।

রাতের ইবাদতের বিশেষ ফজিলত রয়েছে। তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, 'কে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তার প্রার্থনা কবুল করব? কে কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব? কে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব?'"(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)।

রাতের ইবাদত গুনাহ মাফের মাধ্যম এবং জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ বলেন,

"তারা রাতে সিজদাহ এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করে তাদের রবকে স্মরণ করে।"(সূরা আস-সাজদাহ: ১৫-১৬)।
রাতের নিরব পরিবেশ ইবাদতে মনোযোগ বৃদ্ধি করে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,
"নিশ্চয়ই রাতের ইবাদত আরো বেশি দৃঢ় এবং শব্দ উচ্চারণের দিক থেকে অধিক উপযোগী।"(সূরা আল-মুযজাম্মিল: ৬)
রাতের ইবাদত মুমিনের আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং তাকে আল্লাহর প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ করে তোলে।
রাতের ইবাদত শুধু আখিরাতে নয়, দুনিয়ার জীবনেও বরকত নিয়ে আসে। এটি মুমিনের চিন্তাভাবনা ও কর্মে পবিত্রতা নিয়ে আসে।
রাতের ইবাদত আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং মুমিনকে তাঁর প্রিয় বান্দার মর্যাদা প্রদান করে।
মুমিন ব্যক্তি তার রাতের সময়কে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করে। তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া এবং জিকিরের মাধ্যমে সে তার রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
রাতের ইবাদত মুমিনের চরিত্রকে শুদ্ধ করে, তাকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে, এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ বলেন,
"তোমার রব তোমার রাতের ইবাদত সম্পর্কে জানেন।"(সূরা আল-মুযজাম্মিল: ২০)।
মুমিনদের উচিত তাদের জীবনে রাতের ইবাদত নিয়মিত করা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা।

১৪.মুমিনরা হবে পরস্পর ভাই ভাই:

মুসলিম বিশ্বে ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন পৃথিবীর অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে অনুরূপ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পাওয়া যায় না। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মুসলিম ভাইয়েরা ব্যথা পেলে অন্য অঞ্চলের মুসলিম ভাইয়েরা সেই ব্যথায় ব্যথিত হয়, কোন প্রকার কষ্টের স্বীকার হলে সে কষ্টে কষ্টিত হয়। তবে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হলে শর্ত হলো ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রকৃত মুমিন হতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে-
হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন:
"একজন মুমিনের সাথে আরেকজন মুমিনের সম্পর্ক ঠিক তেমন- যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে মুমিনের প্রতিটি দুঃখ কষ্ট ঠিক তেমন অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে।" (মুসনাদে আহমদ)

অপর একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (স.) বলেছেন: "পারস্পরিক ভালবাসা, সু-সম্পর্ক একে অপরের দয়া মায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মতো। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন, তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকতে থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

একজন মুমিনের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান অপর মুমিনের কাছে আমানত। এ আমানতের যদি কেউ খেয়ানত করে তাহলে এর চাইতে বড় অপকর্ম আর হতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (স.) বলেছেন- একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নেই।" (মুসনাদে আহমদ)

ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যত দৃঢ় সম্পর্ক থাকুক না কেন তবুও যেই কোন বিষয়ে মতানৈক্য হতেই পারে। কেননা, "যতজন ততমন- রব তব একজন।" তবে কথা হলো মতানৈক্যটি স্থায়ী হতে পারবে না। মতানৈক্য সৃষ্টি হলেই সেখানে মীমাংসার পথ বেছে নিতে হবে এটি হল কোরআনের নির্দেশ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

"মুমিনদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দু'টি দলের কোন একটি দল অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও এবং ইনসাফ করো, আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।

মুমিনরাতো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।" (সূরা আল হুজুরাত ৯-১০)

অর্থাৎ, একে অপরের সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক মজবুত করে দাও। ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভালোবাসা, দরদ, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব থাকে, পরস্পরের মধ্যে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দাও। কেউ যেন কারো ওপর বিরূপ না থাকে। অবস্থা এরূপ হয়ে গেলে দ্রুত তাদের মিলমিশের ব্যবস্থা করে দেয়া উচিৎ।

রাসূল (স.) বলেছেন- "মুসলমান ভায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিন দিন থাকবে, সামনাসামনি হলে একজন এদিক আরেকজন ওদিক মুখ ফিরাবে এটি কোন মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। দু'জনের মধ্যে সেই উত্তম যে আগে সালাম দিবে।"

কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ আলোকে মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রতি স্থাপনের জন্য যে বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে লালন করতে হবে তা হলো-

১. একে অন্যের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা।

২. একে অন্যের সম্মানহানি না করা।

৩. একে অন্যকে তুচ্ছ মনে না করা।

৪. একে অন্যের মনে কষ্ট না দেয়া।

৫. একে অন্যকে দোষারোপ না করা।

৬. একে অন্যকে বিকৃত নামে না ডাকা।

৭. একে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা না করা।

৮. একে অন্যের পিছনে না লাগা।

৯. একে অন্যের পিছনে গীবত (পরচর্চা) না করা।

১০. একে অন্যের বিরুদ্ধে চোগলখুরি না করা।

১১. একে অন্যকে গালি না দেয়া।

১২. একে অন্যের সম্পদ নষ্ট না করা।

১৩. একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা।

১৪. একে অন্যের সাথে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক বজায় রাখা।

১৫. একে অন্যের সাথে মনোমালিন্য হলে মীমাংসা করে নেয়া।

১৬. একে অন্যকে কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা করা।

১৭. একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা।

১৮. একে অন্যকে সৎকাজে উৎসাহ প্রদান করা।

১৯. একে অন্যের প্রতি মিষ্টভাষী হওয়া।

২০. একে অন্যের জন্য সভা-সমাবেশে জায়গা করে দেয়া।

২১. একে অন্যের জন্য দোয়া করা।

২৩. একে অন্যকে সালাম দেয়া।

২৪. একে অন্যের সালামের উত্তর উত্তমভাবে নেয়া।

২৫. একে অন্যকে সাধ্যানুযায়ী দাওয়াত দেয়া এবং আপ্যায়ন করানো।

২৬. একে অন্যের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা।

২৭. সংঘবদ্ধভাবে থাকা।

২৮. সংঘবদ্ধভাবে নামায আদায় করা।

২৯. সংঘবদ্ধভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা।

৩০. সংঘবদ্ধভাবে সত্য প্রতিষ্ঠার কাজ করা।

১৫.মুমিন ব্যক্তি হবে ধৈর্যশীল সে কখন ও হতাশ নিরাশ হবে না:

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুমিন ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ধৈর্যশীল হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা।

ধৈর্য ও আশা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"আর তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আনফাল: ৪৬)

আরও বলা হয়েছে,

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।" (সূরা যুমার: ৫৩)

হাদিসের আলোকে:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"মুমিনের ব্যাপারটা কতই না চমৎকার! তার সব কাজই তার জন্য কল্যাণকর। যদি তার কাছে সুখ-সমৃদ্ধি আসে, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, আর তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার উপর বিপদ আসে, সে ধৈর্য ধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর।"

— (মুসলিম শরিফ: ২৯৯৯)

তাই মুমিন ব্যক্তি কখনো হতাশ বা নিরাশ হয় না। সে জানে প্রতিটি কষ্ট বা দুঃখের পর আল্লাহ তার জন্য ভালো কিছু রেখেছেন।

১৬.মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে মুমিন ব্যক্তি:

মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার মুমিন ব্যক্তির অন্যতম উত্তম চারিত্রিক একটা গুণ। আর এটা তাদের অধিকার মহান হওয়ার কারণে, যে অধিকার স্থান হল আল্লাহর হকের পরো। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

''আর আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা আন-নিসা: ৩৫ আয়াত)

আল্লাহ তাআলা তাদের আনুগত্য, তাদের প্রতি দয়া ও বিনয় এবং তাদের জন্য দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তাদের উভয়ের জন্য দয়ার সাথে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, হে আমার রব। তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে আমাকে তারা লালন-পালন করেছেন।" [সুরা আল ইসরা: ২৪]

" এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা।' অত:পর জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার মা।' অতঃপর জিজ্ঞেস করল তার পর কে? তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার মা।' অতঃপর জিজ্ঞেস করল তার পর কে? উত্তর দিলেন, 'তোমার পিতা।' বুখারী ও মুসলিম

মাতা-পিতার প্রতি এ সদ্ব্যবহার ও দয়া অনুগ্রহ অতিরিক্ত বা পূর্ণতা দানকারী বিষয় নয় বরং তা হচ্ছে সকল মানুষের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ফরযে আইন।

১৭.আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা:

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর তারা হচ্ছে নিকটাত্মীয়গণ যেমন, চাচা, মামা, ফুফা, খালা, ভাই, বোন প্রমুখ। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব, আর তা ছিন্ন করা জান্নাত হতে বঞ্চিত ও অভিশাপের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যদি তোমরা ক্ষমতা পাও, তাহলে কি তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? তারা তো ঐ সব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। এতে তিনি তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ: ২২-২৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)
মুমিন ব্যক্তি হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও চেষ্টা করে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য।

১৮. প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দরতম ব্যবহার:
প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দরতম ব্যবহার হচ্ছে মুমিনের অন্যতম গুণ। প্রতিবেশী হচ্ছে সে সব লোক যারা আপনার বাড়ীর আশে পাশে বসবাস করে। যে আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী সে সুন্দর ব্যবহার ও অনুগ্রহের সবচেয়ে বেশী হকদার। আল্লাহ তাআলা বলেন,
“মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকীন নিকটতম প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতিও।”(সূরা আন-নিসা:৩৬)

উপরিল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও একজন মুমিনের অসংখ্য গুণ আছে যা আলোচনা করে শেষ হবে না।
তবে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকদের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে সেই কল্যাণ ও মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ, যে সমাজ পৃথিবীর বুকে বিশ্ব মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। আজো পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন- নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি লাভ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, শোষণযুক্ত ভীতিহীন ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের চারিত্রিক ভূষণে পরিণত করতে সক্ষম হই। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত কিছু মুমিনের মর্যাদা

একজন মুমিন ব্যক্তি তার ঈমান এবং আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং তাঁর বিশেষ দয়া ও পুরস্কারের অধিকারী হয়।
একজন মুমিনের মধ্যে ইমানের পূর্ণতা আসার পর আল্লাহতায়ালা তাকে যেসব পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন এটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখিরাতের পুরস্কার।

দুনিয়ার পুরস্কার

১.মুমিনের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ:

অভিভাবক হিসাবে আল্লাহকে পাওয়া। মহা ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ যখন কারও দায়িত্ব নিয়ে নেন, তখন তার আর কিইবা সমস্যা হতে পারে? দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগৎ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহতায়ালা হলেন মুমিনদের অভিভাবক। তাদের তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। (সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৫৭)।

২.আত্মিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি:

মুমিন ব্যক্তি তার অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করে কারণ সে জানে, তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ। আল্লাহ বলেন,
"যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়। শুনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দ, আয়াত ২৮)

৩.বারাকাহপূর্ণ জীবন:

মুমিন ব্যক্তি যে কাজই করে, আল্লাহ তার জীবনে বরকত দান করেন। এতে সে অল্প দিয়ে অনেক সুখ ও তৃপ্তি অনুভব করে।
"যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম।" (সূরা আরাফ, আয়াত ৯৬)

৪.পৃথিবীর রাজত্ব দান করেন:

প্রকৃত মুমিনরা জমিনের কর্তৃত্ব লাভ করবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে, তোমাদের মধ্যকার সত্যিকার মুমিন ও সৎ কর্মশীলদের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমনি দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী মুমিনদের। (সূরা আন নূর, আয়াত-৫৫)

৫.তাওক্কুল ও সাফল্য:

মুমিন ব্যক্তি সব বিষয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। এর ফলে সে জীবনের যেকোনো সংকটে ধৈর্য ধরে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করে।

"যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আত-তালাক, আয়াত ৩)

৬.যার ইমান নেই সে ক্ষতিগ্রস্ত:

প্রকৃত ইমানদার ছাড়া সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, শপথ মহাকালের! নিশ্চয়ই সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ইমান এনেছে, সৎ আমল করেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সূরা আল আসর, আয়াত ১-৩)।

৭.সাহায্য ও রক্ষা:

মুমিন ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পায়।

"আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের সাহায্য করেন।" (সূরা হজ, আয়াত ৩৮)

৮.প্রশান্ত হৃদয় দান:

মুমিনদের হৃদয় শীতল ও সতেজ থাকে। আল্লাহতায়ালা বলেন, (যারা প্রকৃত মুমিন আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর সত্যিকার অর্থে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি এসে থাকে। (সূরা আর র’দ, আয়াত-২৮)।

৯.সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব:

মুমিনরা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহতায়ালা বলেন, যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। যারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। (সূরা আল বায়্যিনাহ, আয়াত : ৭-৮)।

আখিরাতের পুরস্কার

মুমিনদের জন্য আখিরাতে সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো জান্নাত। এর বাইরেও কিছু বিশেষ পুরস্কারে মুমিন ব্যক্তি ভূষিত হবে ইনশাআল্লাহ।

১.জান্নাতের প্রবেশাধিকার:

মুমিনরা তাদের ঈমান ও সৎকর্মের বিনিময়ে চিরকাল জান্নাতে থাকবে।

"যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যেখানে নদীগুলো প্রবাহিত হয়।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৫)

প্রকৃত মুমিনরা জান্নাতের মেহমান। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, অবশ্যই যেসব লোক ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের মেহমানদারি করার জন্য ফিরদাউসের সুসজ্জিত বাগান রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। কখনো সেখান থেকে বের হতে চাইবে না। (সূরা আল কাহফ, আয়াত; ১০৭-১০৮)

২.অপরিসীম সুখ ও শান্তি:

জান্নাতে কোনো দুঃখ, ক্লান্তি বা কষ্ট থাকবে না। মুমিনরা সেখানে স্থায়ী সুখ-শান্তি উপভোগ করবে।

"তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে, তোমাদের কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করবে না।" (সূরা হাজ্জ, আয়াত ৫৬)

৩.আল্লাহর সাক্ষাৎ:

মুমিনদের জন্য আখিরাতের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হবে আল্লাহর দিদার লাভ করা।

"সেদিন অনেক মুখ উদ্ভাসিত থাকবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ২২-২৩)

৪.অপরিমেয় নিয়ামত:

জান্নাতে মুমিনরা যা চায়, তা পাবে। আল্লাহ বলেন:

"তাদের জন্য জান্নাতে যা চায় তাই থাকবে এবং আমাদের পক্ষ থেকে আরও অধিক কিছু।" (সূরা ক্বাফ, আয়াত ৩৫)

৫.পাপের ক্ষমা:

আখিরাতে মুমিনদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তাদের পাপকে সওয়াব হিসেবে পরিণত করা হবে।

"যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তার পাপগুলোকে সওয়াবে রূপান্তরিত করে দেবেন।" (সূরা ফুরকান, আয়াত ৭০)

মুমিন ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার এবং শান্তি রয়েছে। এই পুরস্কারগুলো পেতে হলে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান, ন্যায়ের পথে চলা এবং তাঁর দেওয়া বিধান পালন করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন,

"যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।" (সূরা ত্বহা, আয়াত ১১২)

সুতরাং মুমিনদের উচিত নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করা এবং সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। একজন ইমানদার প্রকৃত মুমিন হলে সে ইমানের স্বাদ পাবে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ইবাদতে অনেক বেশি প্রশান্তি পাবে। মন্দ ও অশালীন কাজের প্রতি অনীহা তৈরি হবে। মুখে আল্লাহর জিকির ও হৃদয়ে আল্লাহর ভয় নিয়ে তার দিনাতিপাত ঘটবে। দুনিয়া হবে তার জন্য জান্নাতের বাগান আর পরকালে পাবে সে সম্মান, মর্যাদা সুখ অফুরান। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রকৃত মুমিন হয়ে ওঠার তাওফিক দান করুন। আমীন।

সংযুক্তি: বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে সংগৃহীত ।